ধারাবাহিক রচনা

পথের টানে

অমরনাথ যাত্রীর ডায়েরি

রাজর্ষি পাল

ইংল্যান্ড প্রবাসী চিকিৎসক

পঞ্চতরণী

খরস্রোতা নদীর ওপরে জেগে থাকা পাথরের ওপর গাছের গুঁড়ি ফেলে ফেলে তৈরি করা সাময়িক সেতু পেরিয়ে ওপারে পৌঁছই। পিছল আর টলমল। ভারসাম্য ঠিক না রাখলে খরস্রোতা নদীতে গিয়ে পড়ব। ওপারে পৌঁছে বেশ কিছুটা দূরে ক্যাম্প, সারি সারি টেন্ট। ক্যাম্পের সামনে পৌঁছে আর একবার চেকিং হল। তখন সন্ধে ছটা বেজে গেছে। ভোর পাঁচটায় যাত্রা শুরু করেছিলাম। টানা তেরো ঘণ্টা হাঁটা, অমরনাথজীর কৃপায়। আজ তেরোই জুলাই, শুক্রবার। আমার বরাদ্দ টেন্টে রুকস্যাক রেখে আশেপাশে ঘোরাঘুরি করলাম। আজ আর আগের দিনের মতন হুটোপাটি নেই। ক্যাম্পের লঙ্গর থেকে রাতের খাবার খেয়ে ঘুমোনোর চেষ্টা করলাম। কাল ভোরে উঠে আবার যাত্রা শুরু হবে। সবকিছু ঠিক থাকলে ঘণ্টা চারেক ট্রেক করলেই পৌঁছনো যাবে অমরনাথজীর গুহায়।

অনেক ওপরে ছাদ। ছাদ চুঁইয়ে জলের ফোঁটা পড়ল ব্রহ্মতালুতে। গুহার ভিতর ওড়াউড়ি করছে দুটি পায়রা।

অমরনাথ গুহা

পরদিন ভোর পাঁচটায় উঠে গোছগাছ করে বেরিয়ে পড়লাম। ঊর্ধ্বাভিমুখী যাত্রা। ট্রি লাইনের অনেক ওপরে এখন। উষালগ্ন, ব্রাহ্মমুহূর্ত। কনকনে হিমশীতল বাতাস। চারপাশে শুধু ন্যাড়া পাহাড়। পর্বতচূড়াগুলি বরফে ঢাকা। মোরেন জোন, গ্লেসিয়ার সব একাকার। পায়ের তলায় বরফ, গ্লেসিয়াল আইস। জমাটবাঁধা শক্ত পাথরের মতন প্রাগৈতিহাসিক গ্লেসিয়ার।

ডানদিকে গ্লেসিয়াল বরফের পাহাড়, বাঁ-পাশে গভীর গিরিখাত। সরু পার্বত্য পথ পিছল এবং

বিপজ্জনক। বাতাসে অক্সিজেন কম। দণ্ডিতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে চলেছি। পনেরো হাজার ফুট উচ্চতার এক ধসপ্রবণ বিপজ্জনক পাস অতিক্রম করে কিছুটা নিম্নাভিমুখী যাত্রা। আবহাওয়া কিছুটা খারাপ, হালকা তুষারপাত হচ্ছে। কয়েক বছর আগে এই পাসে হঠাৎ করে ধস নেমে বেশ কিছু তীর্থযাত্রী গভীর গিরিখাতে নিখোঁজ হয়ে যান।

মাথার ওপর হেলিকপ্টার চক্কর দিচ্ছে। এদিকে ওদিকে পাহারারত সেনা জওয়ান। উড়ো খবর কানে এল, কোথাও একটা কিছু ঘটেছে। অমরনাথ যাত্রা থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। নতুন যাত্রীদের জন্য যাত্রা বন্ধ। আমরা তখন অনেকটা পথ এগিয়ে গিয়েছি। বেলা আটটা। আর ঘণ্টা খানেক ট্রেক করলেই অমরনাথ গুহার পাদদেশে পৌঁছে যাব। বিপজ্জনক সরু পার্বত্য পথ, মোরেন জোনে ঢাকা গ্লেসিয়ার পেরিয়ে এলাম। সামনে অসমান এক উপত্যকার ওপারে পাহাড় উঠে গেছে। শিহরিত হলাম। ওই তো অনেক দূরে, উপত্যকা পেরিয়ে পাহাড়ের ওপর বিশাল গুহামুখ। 'বন্দে শিবং শঙ্করম্'।

ফুটেছে দিনের আলো। বরফ ঢাকা পর্বতশৃঙ্গে প্রতিফলিত হচ্ছে সূর্যালোক। চারপাশে পর্বতে ঘেরা উপত্যকা তখনও কুয়াশাময়। এক মহাজাগতিক অনুভূতি। ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। নিজের অজান্তেই অহংনাশ এবং শ্রদ্ধায় নতি। পার্বত্যপথ পেরিয়ে যারা আসছে প্রত্যেকেরই এক অবস্থা। চারপাশে রোল : 'হর হর মহাদেও।'

সামনের উপত্যকায় সারি সারি তাঁবু। হিন্দুধর্মের সমস্ত শাখা-উপশাখা এসে এখানে মিশেছে। শৈব, শাক্ত, তন্ত্র, স্মার্ত, একেশ্বর, নিরীশ্বর সব একাকার। অতি প্রাচীন এক ধর্মের, এক অধ্যাত্মবাদের পরাকাষ্ঠা যেন অবলোকন করছি, শুরু যার প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতায় অথবা আরও আগে, হাজার হাজার বছরের ব্যবধানেও যা অপরিবর্তিত।

গুহার নিচে, ওপরে, চারপাশে সেনা ছাউনি। নিরাপত্তায় মোড়া। কমলেশ আর চেনা কয়েকজন ঘোড়ায় চড়ে আগেই পৌঁছে গেছে। ওদের কাছেই শুনলাম শেষনাগ ক্যাম্পে আগের রাতে আক্রমণ ঘটেছে। অনেকে হতাহত।

অনেক সিঁড়ি ভেঙে, চড়াই উতরে গুহামুখ। বেশ অনেকটা ওপরে। বিশাল লম্বা লাইন। পাশে আর একটা অপেক্ষাকৃত ছোট লাইন। পরিচিত কয়েকজন বয়স্ক দলে থাকাতে অপেক্ষাকৃত ছোট লাইনে দাঁড়ালাম। সি আর পি এফ-এর জওয়ান আপত্তি করল না।

ধীরে ধীরে চড়াই বেয়ে, সিঁড়ি ভেঙে ওঠা। দুপাশে ব্যারিকেড। স্থানে স্থানে চেকিং পয়েন্ট। হাতে পুজোর নৈবেদ্য। গুহার তলায় কোন এক আখড়া থেকে জোগাড় করেছে কমলেশ। সর্পিল গতিতে লাইন এগোচ্ছে গুহার ভেতরে। একদিক দিয়ে ঢুকে অন্যদিক দিয়ে যাওয়ার রাস্তা। অবশেষে গুহায় ঢোকা। অনেক ওপরে ছাদ। ছাদ চুঁইয়ে জলের ফোঁটা পড়ল ব্রহ্মতালুতে। গুহার ভিতর ওড়া-উড়ি করছে দুটি পায়রা। এই উচ্চতায় এই ঠান্ডায়, ট্রি-লাইনের ওপর পায়রা দুটি কী খেয়ে কীভাবে বেঁচে থাকে, সেটা এক রহস্য। আসার আগেই এই পায়রা দুটির কথা শুনেছিলাম। অনেক পুরনো স্মৃতিচারণেও পায়রা দুটির উল্লেখ আছে। প্রবাদ আছে, পায়রা দুটি নাকি অমর। ''বিশ্বাসে মিলায় বস্তু।''

বুটা মালিক নামে এক মুসলমান মেষপালক এই গুহা ও বরফের শিবলিঙ্গের কথা প্রথম জানান। তাঁর জীবনে কিছু অলৌকিক ঘটনা ঘটে। প্রায় ছশো বছর আগের কথা এটি। তাই স্থানীয় মুসলমানরা এই গুহাকে খুব শ্রদ্ধা করেন, তীর্থযাত্রীদের সবরকম সহায়তা করেন জঙ্গিদের চোখরাঙানি সত্ত্বেও।

বরফের শিবলিঙ্গ পুরোপুরি প্রাকৃতিকভাবে তৈরি। চাঁদের আপেক্ষিক গতি অনুযায়ী আয়তনে বাড়ে-কমে। মূল লিঙ্গ ছাড়াও গুহার মধ্যে আরও

দুটি ছোট লিঙ্গ আছে। একটি মা পার্বতীর, অপরটি গণেশের প্রতিভূ।

বৈজ্ঞানিক মতে, প্রাকৃতিকভাবে তৈরি বরফের স্ট্যালাগমাইট এবং স্ট্যালাগটাইট। কিন্তু বিজ্ঞান ব্যাখ্যা দিতে পারেনি, কীভাবে গ্রীষ্মকালে, যখন চারপাশে গ্লেসিয়ার গলে জল হচ্ছে, তখন গুহার ভিতরে, প্রকৃতির কোন নিয়মে জল জমে বরফ হচ্ছে। নিশ্চয়ই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে, তবে ''বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর।'' আগে আট ফুট উচ্চতার শিবলিঙ্গ তৈরি হত। এখন উচ্চতা কম। 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং'-এর ফল।

পুজো দিয়ে, অমরনাথজীর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে, শিবলিঙ্গের বরফগলা জল বোতলে ভরে অন্যদিক দিয়ে পাহাড় বেয়ে নেমে এলাম।

এবার ফেরার পালা। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া হল। নানা মুখে নানা কথা শোনা গেল। আগের দিন রাতে শেষনাগ ক্যাম্পে কিছু একটা ঘটেছে। নানারকম গুজব। ফৌজি জওয়ানরা মুখে কুলুপ এঁটেছে। আমার হাতে দুটো দণ্ড ছিল, স্থানীয় গাছ কেটে বানানো লাঠি। পাহাড়ি রাস্তায় ওঠা-নামা করতে, শরীরের ব্যালান্স রাখতে সুবিধা হয়। একটি দণ্ড একজন কমবয়সি ব্রহ্মচারীকে দিয়ে দিলাম। এখন উতরাইয়ের পথ। চড়াই কম, কষ্টও কম।

বালতাল-সোনমার্গ-শ্রীনগর

এসেছিলাম পহেলগাঁও, চন্দনওয়ারি, শেষনাগ, পঞ্চতরণী হয়ে। ফেরাটা অন্য পথে, বালতাল সোনমার্গ হয়ে। বেশ খাড়াই কয়েকটা মাউন্টেন পাস পেরুতে হয়, খুবই কষ্টকর। তবে একদিনে শ্রীনগর পৌঁছনো যায়। সোনমার্গে আছে ইন্ডিয়ান আর্মির একটি বড় বেস, আর আছে হাই অল্টিটিউট ওয়ারফেয়ার স্কুল, মাউন্টেন ওয়ারফেয়ারের ট্রেনিং হয়। পৃথিবীবিখ্যাত। খুবই স্পর্শকাতর জায়গা। তাই বেশি মানুষকে এই রুটে পারমিট দেওয়া হয় না।

বালতালের পথ ধরলাম। পাহাড়ি রাস্তা। একদিকে খাড়া পাহাড়, অন্যদিকে গভীর গিরিখাত। কোথাও কোথাও পথ খুবই সরু এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক। প্রায় পাহাড়ের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে জায়গাগুলো অতিক্রম করা হল। আমাদের রওনা হতে হতে দুপুর পেরিয়ে গেছে। সূর্য অস্তাচলের পথে। পার্বত্য অঞ্চলে সূর্য তাড়াতাড়ি পাহাড়ের আড়ালে চলে যায়, রাতের আঁধার তাড়াতাড়ি নেমে আসে। আজ আর মনে হয় না বালতাল অবধি পৌঁছনো যাবে। কোনও একটি লঙ্গরে রাতে মাথা গোঁজার আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল তাড়াতাড়ি। অন্ধকার পাহাড়ি পথে হাঁটছি। হোঁচট খেতে খেতে উতরাইয়ের পথে নামা। বেশি তাড়াতাড়ি নামতে গেলে হুমড়ি খেয়ে পড়ব। রাতে থাকার আস্তানা বের করতেই হবে। বয়স্ক যাঁরা ছিলেন তাঁদের ঘোড়ায় চড়িয়ে অনেক আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আশা করি তাঁরা বালতাল পৌঁছে গেছেন এতক্ষণে। আমাদের পৌঁছনোর আশা সুদূরপরাহত।

কিছুটা সমতল এক উপত্যকায় পৌঁছলাম। অন্ধকারে ভাল করে কিছু দেখাও যায় না। এদিক ওদিক দু-একটা ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বলছে। একটা আউটপোস্টে পৌঁছলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম সি আর পি এফ আউটপোস্ট। পরে বুঝলাম জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের আউটপোস্ট এটা।

একটি খাটিয়ায় বসে দুজন উর্দিধারী পুলিশ টিফিনবাক্স থেকে রাতের খাবার খাচ্ছে। অযাচিতভাবে আমরা গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমাদের গলদঘর্ম পরিশ্রান্ত চেহারা দেখে আমাদেরকে খাটিয়ায় বসতে দিল। ওদের জলের বোতল বাড়িয়ে দিল। তার পরে আরও অবাক করে দিয়ে এগিয়ে দিল ওদের টিফিনবাক্স, ভাগ করে খাওয়ার জন্য। ওদের আন্তরিকতা দেখে মনের অবস্থা প্রকাশ করার মতো ভাষা খুঁজে পেলাম না।

আবেগ উঠে এল বুকের ভেতর থেকে। জিজ্ঞেস করে জানলাম, আমার দিকে টিফিনবাক্স বাড়িয়ে দিয়েছিল যে-ছেলেটি, তার বাড়ি জম্মুতে। ওর থেকে সামান্য কিছু খেলাম। জানলাম, আরও আধঘণ্টা খানেক দূরে একটি লঙ্গর আছে, তীর্থযাত্রীদের রাতে থাকার ব্যবস্থা আছে সেখানে।

অন্ধকারে আবার পথচলা শুরু। পথে এখন চড়াই উতরাই কম। অপেক্ষাকৃত সমতলভূমির ওপর দিয়েই যাচ্ছি। অন্ধকারে চারপাশে বিশেষ কিছু দেখা যাচ্ছে না। দূরে অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে আলোর বিন্দু। পৌঁছে দেখি আলো ঝলমল করছে। বেশ বড় এক লঙ্গর। বিশাল শামিয়ানা খাটানো। মেঝেতে কার্পেটের ওপর ঢালাও শোয়ার ব্যবস্থা।

লঙ্গরের ভলান্টিয়ারদের হাবভাব সন্ত্রস্ত। সন্দেহের চাউনি। প্রত্যেক তীর্থযাত্রীকেই আগাপাশতলা পরীক্ষা করে নিচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে, শেষনাগের জঙ্গি আক্রমণের ফল।

একটি কম্বল মাটিতে বিছিয়ে, আর একটা কম্বল গায়ে দিয়ে রুকস্যাকে মাথা দিতেই গভীর ঘুমে। অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছনোর পর এই কদিনের উৎকণ্ঠার অবসান।

ঘুম ভাঙল ভোরবেলায়। এক ঘুমে রাত্রি পার করেছি। তাড়াহুড়ো করে উঠে তৈরি হয়ে আবার পথচলা শুরু হল। পথে মানুষের ভিড়। দুপাশে পাহাড়ের মাঝে এক প্রশস্ত উপত্যকা। এদিকে ওদিকে আরও লঙ্গর। স্নিফার ডগ নিয়ে বম্ব স্কোয়াড টেন্টগুলিতে ঘুরে ঘুরে সার্চ করছে।

বালতালে যখন পৌঁছলাম তখন সূর্য উঠে গেছে। পথে ভিড়। আমাদের চেনা কয়েকজনকে খুঁজে পাওয়া গেল। বাকিরা শুনলাম গাড়িভাড়া করে শ্রীনগরের দিকে রওনা হয়ে গেছে।

কমলেশের কল্যাণে টাটা সুমো জোগাড় হল। শ্রীনগরের দিকে যাত্রা শুরু হল। সোনমার্গের কাছাকাছি কোথাও একবার দাঁড়িয়েছিল। বোধহয় গাড়ির পারমিট চেকিংয়ের ব্যাপার ছিল। বেশ অনেকক্ষণই দাঁড়িয়েছিল। গাড়ি থেকে নামিনি। তবে পথে দেখেছিলাম আর্মির তৎপরতা। গল্পে পড়া যুদ্ধকালীন তৎপরতা কাকে বলে, সেদিন দেখেছিলাম। গোটা জম্মু বা কাশ্মীরের আর কোথাও এই জিনিস দেখিনি। ফুল কমব্যাট গিয়ারে আর্মির কমব্যাট ইউনিটের সুশৃঙ্খল রুট মার্চ চলছে। একজন সিভিলিয়ানের চোখ দিয়ে এই দৃশ্য দেখেছিলাম। সেদিন প্রথম অনুভব করেছিলাম হৃদয়ের গভীর থেকে এক দারুণ গর্ববোধ। সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা আর আত্মত্যাগের সঙ্গে একাত্মবোধ করেছিলাম।

সোনমার্গ পার হওয়ার পর ঘুমে ঢলে পড়ি। ঘুম ভাঙে গাড়ি শ্রীনগরে ঢোকার পর। শ্রীনগরে নেমে আবার ডাল লেক। শিকারা বেয়ে হাউসবোটে পৌঁছলাম। এই কদিনের পরিশ্রমে, স্নান না করে, দাড়ি না কামিয়ে চেহারাগুলি হয়েছিল দেখার মতন। স্নান করে খেয়ে ঘুমিয়ে ভদ্রস্থ হলাম।

আশ্চর্য সাক্ষাৎ

সন্ধ্যার পর কমলেশ কানে কানে একটি কথা বলল। একজনকে ও চেনে, যে আগে উগ্রপন্থী ছিল, এখন সারেন্ডার করেছে। ওর কাছে যাচ্ছে কিছু খবর পাওয়া যায় কী না দেখতে। চাইলে আমিও যেতে পারি। তাড়াহুড়ো করে তৈরি হয়ে নিলাম। শিকারা বেয়ে ডাঙায় এলাম। একটি অটো থামিয়ে চট করে উঠে পড়া গেল। ডাল লেকের পাড়ে অন্য আর একদিকে নামিয়ে দিল। তখন সন্ধে হয়ে এসেছে। ডাল লেকের পাড় ধরে হাঁটছি। বাঁ দিকে একটি টানা উঁচু পাঁচিল। ডান দিকে ডাল লেকে সারি সারি হাউসবোট, জরাজীর্ণ অবস্থা। কয়েক দশকের উগ্রপন্থার ফসল। ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রিকে ধ্বংস করে কাশ্মীরের সাধারণ মানুষকে পথে বসিয়েছে। মিনিট দশেক হাঁটলাম। একটি

পুরনো হাউসবোটের সামনে কয়েকটা বাচ্চা খেলা করছে। কমলেশকে দেখে দৌড়ে এসে হাত ধরল। বুঝলাম কমলেশের খুবই পরিচিত। ওদের উচ্ছ্বাসে হাউসবোটের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন এক বৃদ্ধ, মুখে সাদা দাড়ি, মাথায় কাশ্মীরি টুপি। কমলেশকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আমাদেরকে ভেতরে নিয়ে বসালেন। অপরিচিত মুখ দেখে আমার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখলেন। কাপে করে মশলা দেওয়া কাশ্মীরি চা এনে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে ঘরে যে ঢুকল, তার চেহারা ভুলব না। ছোটখাট পেটানো চেহারা, চোখ দুটো ভাঁটার মতন জ্বলছে। এ সেই বৃদ্ধের ছেলে, প্রাক্তন জঙ্গি। আমাদেরকে খাতির করল। আমার যদিও অস্বস্তি হচ্ছে, সে কিন্তু স্বচ্ছন্দ। নিজের কথা বলতেই ব্যস্ত। কমলেশ জিজ্ঞেস করল শেষনাগ ক্যাম্পে আক্রমণের ব্যাপারে কোনও খবর আছে কী না। সে জানাল আজ রাতে ওর কাছে বিশদে খবর আসবে।

নানা কথার ফাঁকে নিজের সম্বন্ধে অনেক কথা বলল। ১৯৮৯-এ বর্ডার পেরিয়ে ‘আজাদ কাশ্মীরে’ যায় ট্রেনিং নিতে। ফিরে আসার পর ওর ওপর দায়িত্ব পড়ে ইস্টার্ন জোনের। বাংলাদেশ বর্ডার পার হয়ে যে-জঙ্গিরা ঢুকছে তাদের নিরাপদে কাশ্মীরে পৌঁছে দেওয়া ছিল ওর কাজ। শালওয়ালার ছদ্মবেশে বাংলা, বিহার, আসাম, ওড়িশায় ঘুরে রেইকি করে বেড়াত।

১৯৯১-এ বাবরি মসজিদ ভাঙার পর কাশ্মীরে ফিরে যায় ও। বাবরি মসজিদ ভাঙার পর কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরের পেছনে জ্ঞানবাপী মসজিদও নাকি ভাঙার পরিকল্পনা হয়েছিল। পাকিস্তান থেকে আসা অর্ডার অনুযায়ী জঙ্গিদের এক সুইসাইড স্কোয়াড জ্ঞানবাপী মসজিদের ভেতরে লুকিয়েছিল। শেষ অবধি আর জ্ঞানবাপী ভাঙা হয়নি। ওরাও কাশ্মীরে ফিরে গিয়ে স্থানীয় উগ্রপন্থায় অংশ নেয়। ওর সারেন্ডার করার কারণটি চিত্তাকর্ষক। এক কাশ্মীরি মেয়ের প্রেমে পড়েছে। মেয়েটি শর্ত দিয়েছে জঙ্গিপনা বন্ধ না করলে বিয়ে করবে না। তাই বেগতিক দেখে সে আত্মসমর্পণ করেছে। সফট পাওয়ারের জয় হয়েছে। হবু বউয়ের ফটো দেখিয়েছিল।

কাটরা-বৈষ্ণোদেবী

পরদিন ভোরে টাটা সুমো করে শ্রীনগর থেকে জওহর টানেল পেরিয়ে জম্মু পৌঁছলাম। কাশ্মীর থেকে বেরোনোর পথে আর জওহর টানেলে সিকিউরিটির কড়াকড়ি নেই। কাটরাতে ছিলাম দুদিন। সারাদিন পায়ে হেঁটে পাহাড়চূড়ায় বৈষ্ণোদেবীর মন্দিরে উঠেছিলাম। সেটাও ছিল মনে রাখার মতন এক অভিজ্ঞতা।

বাড়িতে ফোন করেছিলাম জম্মুতে পৌঁছে। তার আগে শেষ ফোন করেছিলাম অমরনাথ যাত্রায় রওনা হওয়ার আগের দিন, যেদিন জওহর টানেল পেরিয়ে কাশ্মীরে ঢুকেছিলাম, কুপওয়ারাতে মিলিটারি ক্যাম্পে সুইসাইড অ্যাটাক হয়েছিল।

শেষনাগ ক্যাম্পে জঙ্গিহানায় অসংখ্য তীর্থযাত্রীর হতাহতের খবরে, আর আমার কোনও খবর না পাওয়ায় বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন ধরে নিয়েছিলেন আমারও স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটেছে। বাড়িতে ফোন করার পর আমার গলার আওয়াজ পেয়ে মা কান্নায় ভেঙে পড়েন, খুশির কান্না।

যেদিন শেষনাগে জঙ্গি আক্রমণ ঘটে, সেদিন ক্যাম্পে ছিল হাওড়ার বালির চার-পাঁচজনের একটি দল। জঙ্গিদের গুলিতে একজন বাদে বাকিরা মারা যায়। যে বেঁচে যায়, সে ফিরে এসে রবিবাসরীয় আনন্দবাজারে একটি প্রবন্ধ লেখে কয়েক সপ্তাহ পর—‘মৃত্যুতীর্থ অমরনাথ’। সেই লেখা থেকেই বিশদে জানতে পারি সে-রাতে জঙ্গি আক্রমণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা।